সুফিতত্ত্বে দেহকথা

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–২

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৩

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৪

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৫

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৬

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৭

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৮

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–৯

সুফিতত্ত্বে দেহকথা–১০

সুফিতত্ত্বে দেহকথা

সোমব্রত সরকার

সুফিতত্ত্বে দেহকথা
সোমব্রত সরকার

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০২৪

রোদেলা ৭০৫

রোদেলা

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

বইবাংলা
স্টল নং ১৭ ব্লক, ২ সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫

অনলাইন পরিবেশক
http : //rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স ৪৮/৩ জাস্টিস লাল
মোহন দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

Sufitotta Dehokatha By Somabrata Sarkar
First Published *Book Fair 2024*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, (Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. wwWrodelaprokashani.com

Price : Tk. 300.00 Only   US $ 10.00
ISBN : 978-984-98235-7-5   Code : 705

দেহ পিঞ্জিরার পাখি
কী নামে তোমায় ডাকি
দেহ গেলে উড়বে কোথায়
রইবে পাখি কোন কলিজায়

সূচিপাতা

১.
প্রেম পিরিতের উৎস ধারা ৯
সে বড় কঠিন ঠাঁই ২৫
একই আকাশ ঘটে ঘটে ৩৭

২.
গাজি গঙ্গা নিঘাহ্ বান ৫৩
আসা যাওয়া যে পথে ৬৬
ডুব দেও তুমি অগাধ জলে ৮০
সিন্ধুপাড়ের বন্ধু যে জন ৯৩

৩.
চেয়ে দ্যাখ তোর অন্তঃপুরে ১০৩
বায়ুর ঘর বায়ুর বাড়ি ১১৯
পৃথিবী অন্তরে আর গগন কৈলাস ১৩৩

পরিশিষ্ট ১৪৭
ভাবের ভিতর পশবি যখন ১৪৭

১

প্রেম পিরিতের উৎস ধারা

সহজই আত্মা
সহজই সাঁই
সাঁইয়ের ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই

দেহাত্মবাদের প্রচার তরিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক একটা যোগসূত্র সব সময়ই ছিল। লৌকিক অধ্যাত্মবাদের ভেতর সঙ্গীতাশ্রয়ী সাধন-ভজন বড় একটি বিষয়। Folk etymology...লোকনিরুক্তি থেকেই সাধন-ভজনের সাম্প্রদায়িক ছোট্ট ছোট্ট এলাকাগুলো আদতে এখানে গড়ে ওঠে। চোদ্দো শতকে লেখা শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' গ্রন্থটিতে বাউল শব্দের প্রয়োগটির দেখা মেলে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃতের' ভেতরও বাউল শব্দের নিন্দাসূচক প্রয়োগ রয়েছে। কবিরাজ মশাই বাউলিয়া কথাটির উল্লেখ রেখেছেন। বাউল থেকে বাউলিয়া, Folk etymology. ঠিক এমনি করেই আউলিয়া থেকে আউল কথাটি চালু হয়েছে। আল কথাটি আরবি-ফারসি। বাংলায় বাউল শব্দটি নিষ্পন্ন হওয়ার পেছনে আল শব্দটির বিবর্তনবাদকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ারও নয়। দেহাত্মবাদের নানান সব তরিকার ভেতর বহমান মিশ্র মতবাদ নানান কালিক চিহ্ন নিয়ে বরাবরই ঢুকে গেছে। সেজন্যই দেহবাদী সাধন এলাকায় সংমিশ্রণটি একেবারেই চোখে পড়ার মতনই। চৈতন্যদেবের নিজেকে মহাবাউল বলে ঘোষণার ফোঁকর গলে বৈষ্ণবীয় সাধনার ভেতর বাউল সাধনাকে একীভূত করার একটি প্রক্রিয়া তখনই চালু ছিল। সুফিদের আউলিয়া বলে দেগে দেওয়াটিও Folk etymology. চৈতন্যদেবের নদিয়া তখন মুসলমানদের অধীন। সুফিরা এসময় নদিয়া জুড়ে খানকা নির্মাণে নেমে পড়েছেন। এখানে মুসলমানি চলের আগে হিন্দুআনি ব্রাহ্মণ্যবাদ অনেক দিন নিষ্পেষিত করেছে নমঃশূদ্রদেরই। মুসলমান সুফি ফকিরদের

উদারতা স্বভাবতই তখন তাদের দলে টেনে নিয়েছে। বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও সে সময় যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদী নিষ্পেষণের শিকার তেমনই নিম্নবর্গীয় হিন্দুদেরও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সেখান থেকেই সুফি সাধকগণের উদার দেহাত্মবাদী তরিকা এদের কাছে টেনেছে। হিন্দু চেতনায় সুফি ফকিরদের প্রভাব এভাবেই ঢুকে গেছে। এভাবেই দেহাত্মবাদীরা হিন্দু–মুসলমান সমন্বিত একটা ধর্মীয় চেতনা তথা সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে বসেছেন বাংলার বুকে। গোটা নদিয়া জুড়েই এরপর দেহাত্মবাদীদের সংখ্যাধিক্য। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙা জুড়ে তখন দেহাত্মবাদী সাধকগণের যাতায়াত। এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ স্তূপা ও মঠগুলোর দিকে ফিরে তাকালে ব্যাপারখানা আরও ভালো করে বোঝা যাবে। লৌকিক ইসলামের সঙ্গে তখন ইসলামের বাড়বৃদ্ধি। চুয়াডাঙাতে মসজিদ হচ্ছে। ঘোলদাড়ির মসজিদখানি কিন্তু সে সময়কারই। চারুলিয়া গাঁয়ের চারটি প্রাচীন আউলিয়া কবর আবার দেহাত্মবাদের এলাকাকেও স্পষ্ট করছে। মেহেরপুরে তখন সুফি সাধকদের বসতি। বাগওয়ানের খানকারও প্রাচীনতা রয়েছে। মেহেরপুরের আউলিয়া তখন শেখ মুহাম্মদ জহির উদ্দীন। শাহ ভালাই নামে ওঁর প্রসিদ্ধি। তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবেও তখন এলাকাতে আদৃত। গ্রামীণ মানুষ রোগভোগ, দুঃখব্যাথা সব নিয়েই তখন থেকেই ছুটে ছুটে যাচ্ছে। মেহেরপুরে শাহ ভালাইয়ের মাজার আজও পরিলক্ষিত। কাছেই মুজিবনগর। নামটা স্বাধীন বাংলাদেশ আমলের। কিন্তু এখানকার বাগওয়ান গ্রাম তৎকালীন অখণ্ড নদিয়ার। এখানে ফরিদ শেখের মাজারও সেই পুরোনো সময়ের। চারুলিয়ার মালেকুল গাউসের কবরও সমসাময়িক। কুষ্টিয়া শিলাইদহের পাশের গাঁ খোরদেশপুর। নামকরণই হয়েছে জায়গার সুফি পির খোরশেদ শাহের মাজার থেকে। পুরোনো কুষ্টিয়ার পদ্মার ধার ধরে এখনও আছে একদিল শাহের দরগাখানা। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে নদিয়া জুড়ে তখন সুফি-পির-ফকিরদের বসতি। সকলেই এঁরা তাত্ত্বিক। ইসলামের মূল স্তম্ভের সঙ্গে এঁরা সব পারস্যের ভাবকে সুচারুরূপে জুড়ে দিয়ে ধর্মের একটা সমন্বয় সাধন করে বসে এলাকাবাসীদের কাছে সাধক, চিকিৎসক হিসেবেও আদৃত হয়েছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ–মুসলিম সকল সম্প্রদায়কে এক আসনে বসিয়ে তাঁরা ধর্মকথা বলছেন। এরপরই গোটা বাংলা জুড়ে পরে গড়ে উঠেছে সুফি সাধকগণের নানান তরিকাগত আলাদা আলাদা ধারা। খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর নামে চিশতীয়া ধারা, শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নামে সোহরাওয়ার্দীয়া ধারা, শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর নামে কাদেরিয়া ধারা এবং বু আলী

কন্দরের নামে কলন্দরীয়া ধারা, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবান্দের নামে নকশবন্দীয়া ধারার সৃষ্টি।

দেহাত্মবাদের বাংলায় চিশতীয়া সুফিরা অধিক মন টেনেছিলেন গ্রামের মানুষজনের তাঁদের নবিসঙ্গীতের মাধ্যমেই। বাংলার মারফতি ধারার সঙ্গে চিশতীয়া সুফিদের এখানেই বোধহয় প্রধান ঐক্যটি গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালীর গ্রামীণ সংস্কৃতি ছিল তখন পির ও মুর্শিদ নিয়ন্ত্রিত। উরসের সময় মাজারে মারফতি গান চলে। মুর্শিদ্যা গানেরও প্রচলন এভাবেই মুর্শিদ নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সংস্কৃতির থেকেই। মুর্শিদ শব্দটি আরবি ইরশাদ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো গিয়ে নির্দেশ। শিষ্যকে গুরু কীভাবে সাধন-ভজন করতে হবে সেসব তরিকা-নির্দেশ দেন। যিনি পথ দেখাতে পারেন, সাধন নির্দেশ দিতে পারেন সাবলীল ভাষায় তিনিই মুর্শিদ। Folk etymology অনুসারে এভাবেই মুর্শেদ শব্দটি দেশিয় ভাষাতে গুরুর সাজুয্যে বসে গেছে দেহাত্মবাদের বাংলায় মারফতি গানের সংস্কৃতিতেও। পির মুর্শেদেরা একসময় খানকায় গজল গাইতেন। সুফি পিরেরা সামা গাইতেন। সকলেই প্রায় কবি ছিলেন। হাছন রাজা, আরকুম শাহ, এঁরা সব সুফি অনুসারী কবি ছিলেন। সুফি সাধকগণ নিজেদের খানকাতে বসে যেমন সাধনা করতেন তেমনই সাধন অনুভূত সত্য দিয়েই মারফতি গান, মুর্শিদ্যা গান লিখতেন। এ ধারা তো আজও জায়মান। পির-ফকির-বাউল-দরবেশ-অলি-আউলিয়া-সাঁইধারার সমস্ত দেহাত্মবাদী সাধকেরা মারফতি গান লিখে থাকেন। বলা ভালো এটাই দেহাত্মবাদের বাংলায় নজর করা এক ভেদাভেদহীন ধর্ম-সংস্কৃতি।

প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের সম্পর্ক নিয়ে মরমিয়াবাদীরা সব গান লিখতেন। আল্লাহর প্রিয় নবিরা ছিলেন সকলেই মাশুক। মাশুক আর আশেক নিয়ে গড়ে ওঠা সহজ সাবলীল আল্লাহ, নবিদের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীত সংস্কৃতি সহজেই তাই মিশে গিয়েছিল দেহাত্মবাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে। চিশতীয়ারা সেজন্যই সহজ হতে পেরেছিলেন বাংলার জনগণের সঙ্গে। তাঁরা যেমন মানুষজনের রোগভোগ দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নাম পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াতকে ঝাড়ফুঁক এবং তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করতেন তেমনই তাঁরা ঔষধি লতা চিনতেন। গাছ-ছাল-বাকল-মূল-পাতা দিয়ে তাঁরা সব আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাটাও করতেন। এতে মানুষের আরোগ্য হত। পারস্য, ইরাক, আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির একটা যোগসাজশ তো ছিলই ভারতবর্ষের। সুফিরা যখন এলেন পারস্য দিয়ে তখন তাঁরা যেমন এখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেন

তেমনই এখানকার সংস্কৃতির সামঞ্জস্যটি তাঁদের অধরা নয় বলে সুবিধাজনক অবস্থানে গিয়ে তাঁরা বাংলার জনগণের ভেতরও প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন। সুফিদের সাজুয্য নিয়ে পরে যখন বাংলার লৌকিক ইসলাম পাল্লাভারী হলো তখনই এখানে গড়ে উঠল নাড়ার ফকির সম্প্রদায়। এইসব ছোট ছোট দেহাত্মবাদীদের দলগুলোর সমস্তটাই পরে দেশজ ধর্মীয় আচারের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নিল। তবে মূল ধরতাইটি থাকল দেহাত্মবাদীদের ধর্মে জাতপাতহীন এক সমন্বয়ের সংস্কৃতির। এখানেই তাঁরা নজির গড়লেন। অনন্য হলেন। ভারতীয় বোধকে মিলিয়ে দিলেন। একীভূত সংস্কৃতির নজিরটি ছিল সেই মোগল আমলে, আকবরের সময়কালেই। দীন এলাহি ধর্মের প্রবর্তনা দিয়ে তিনি সে সময় এদেশের অমুসলিম মানুষদের মন জয় করেছিলেন সুফি সাধকগণের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তাঁরই প্রৌপুত্র দারা, সম্রাট শাহজাহানের ছেলে। দারা মধ্যযুগের ভারতে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে নিযুক্ত থাকা একজন ধর্মাচারী উদার মানুষ। তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্ম চেতনা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মন নিয়েই তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন গোটা দেশকে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়েছিল অল্প বয়সেই। দাদুর সভার ধর্ম সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আবুল ফজল ও ফৈজি। নবরত্নদের মধ্যে আরও ছিলেন বীরবল, টোডরমল, মানসিংহ। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সম্রাট আকবরকে এঁরা সাহায্য করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকারী মতামত সব চাপা পড়ে যায়। ঠাকুরদাদার উদার মনোভাবটি পেয়েছিলেন আকবরের নাতি দারা আর আরেক নাতি আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া। ভারতীয় ইসলামের উদারচেতা ভাবকে গাড্ডাতে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। দারাকে তিনি অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন। যেহেতু দারার রাজ্যস্পৃহার থেকে জ্ঞানস্পৃহা বেশি ছিল সেজন্যই আওরঙ্গজেবের এ কাজে আরও সুবিধা হয়েছিল। চিশতীয়া ও কাদেরিয়া ধারার সুফি সাধকগণের সঙ্গে দারা শুকোহের অনন্য সংযোগ ছিল। তিনি এই দুই সাধনপথের ভেতর দিয়েই তো চলেছিলেন আজীবন। তিনি ফিরদৌসি ও সাদীর থেকে রুমী ও জামীকে পছন্দ করতেন বেশ। হিন্দি পর্যন্ত শিখেছিলেন দারা শুকোহ্। কাশীতে হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে রীতিমত নাড়া বেঁধে হিন্দিতে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। উপনিষদ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি পারসি ভাষাতে উপনিষদের অনুবাদ পর্যন্ত করেছিলেন। গীতা, যোগবাসিষ্ঠসারেরও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও সাহিত্য তাঁকে প্রবলভাবে টেনেছিল। আরবি, পারসি শিখেছিলেন। তিনি মুসলমান হিন্দু প্রভৃতি নানান ধর্মের সন্ত সাধকদের সঙ্গে

ওঠাবসা করেছিলেন অধ্যাত্ম জিজ্ঞেসু হয়েই। মূলত তিনি ছিলেন Mystic...সুফি মতাবলম্বী। হিন্দু যোগি বাবালালকে তিনি যেমন সম্ভ্রম করতেন তেমনই সুফি সাধকদেরও তিনি মান্যতা দিতেন একই সমতায়। তিনি তাঁর লেখা সমস্ত বইতে গৌরচন্দ্রিকায় খোদার প্রশংসা ও হজরত মুহম্মদের স্তুতি করতেন। তথাপি তাঁর চরিত্রেই ধর্মদ্রোহিতার দাগ দিয়ে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক ট্রাজিক অধ্যায়। দারার গুরু ছিলেন মুল্লা শাহ। গুরুর নির্দেশেই তিনি অন্যান্য ধর্মের সাধুসঙ্গে এসেছিলেন। গুরু বুঝেছিলেন তাঁর শিষ্যটি হলো সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির মানুষ। সে কারণেই গুরু অনুমতি করেছিলেন। সুফিবাদের ওপর চারটি গ্রন্থ লিখেছিলেন দারা শুকোহ্। 'সকিনৎ উল আউলিয়া' গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন নিজের গুরুর কথা। কাদেরিয়া ধারার সাধক তিনি। স্বভাবতই গুরুর কথা বলতে গিয়েই তিনি এখানে কাদেরিয়া ধারা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'রিসালায়ে হকনামাতে' তিনি সাধনার বিভিন্ন স্তর নিয়ে কথা বলেছেন। 'সাথীয়াৎ' ও 'তরিকৎ উল হকিকতের' ভেতর তিনি চিশতীয়া, কাদেরিয়া নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া ধারা নিয়ে বিস্তারিত কথকতা করেছেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'মাজমা উল বাহরায়েন' কিতাব। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়বাদটি প্রবলভাবে ধরা পড়ে। ১৬৫৭ সালে তিনি লিখলেন শেষ গ্রন্থ উপনিষদের পারসি অনুবাদ। ছ'মাস সময় নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাশীর কয়েকজন বিদগ্ধ মণ্ডলীর সহায়তায় তিনি বাহান্নটি উপনিষদের অনুবাদ করলেন। এভাবেই সুফি ভাবধারার সমন্বয়বাদী চিন্তাকে স্পষ্ট করেছিলেন দারা শুকোহ্।

সুফি-আউলিয়াগণের সমন্বয়বাদী চেতনা থেকেই দেহাত্মবাদের বাংলাতে সত্যনারায়ণের রূপান্তর ঘটল সত্যপিরে। এভাবেই বাংলায় গড়ে উঠল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রবল ঐক্য...মানিক পির, ঘোড়া পির, কুম্ভীর পির, মাদারি পিরদেরও আবির্ভাব, সুফি-দরবেশ-পিরদের আধিক্য। তাঁরা ঝাড়ফুঁক করছেন, ধর্মকথা বলছেন, তাবিজ–কবজ দিচ্ছেন আবার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করছেন যেগুলো একসময় করতেন বাংলার তান্ত্রিকেরা। তাঁদের চরিত্রে অলৌকিক ক্ষমতাধারীর আখ্যা ছিল। এখানে এবার যুক্ত হলেন পির-ফকিরেরা। তাঁদের প্রবল ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আবার কালীর থান মাজার, দরগাও হয়ে উঠল। তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যরাও সে সময় লৌকিক ইসলামে চলে এলো ক্ষমতাধারী পিরদের দাপটে। ঠিক যেভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণদের চাপে বৌদ্ধরা একসময় ধর্মান্তরিত হয়েছিল। মধ্যযুগের লেখা 'ধর্মপূজাবিধান' বইতে সে বৃত্তান্তও আছে। হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিষ্পেষণে দেহাত্মবাদের বাংলায় দেখা

দিলো আবারও Folk etymology...লোকনিরুক্তি। গণেশ হলেন গাজি, কার্তিক কাজি, চণ্ডিকা দেবী রূপান্তরিত হলেন হ্যাঁয় বিবিতে, দেবী পদ্মাবতী হলেন বিবি নূর। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে ধর্মান্তকরণের ফলে গড়ে ওঠা এইসব লোকনিরুক্তির নানান নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফি দরবেশ ও পিরই এইসব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন, ক্রমে পিরগণও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পিরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের দুঃখ দুর্দশা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন। আবার জীবন্ত মানুষকেও জাদুবলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যেরাও অনেকে স্থান–মাহাত্ম্যে এবং এইসব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পিরের দর্গায় আসিত এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত।

বাংলাদেশের দরবেশ ফকিরদের ভেতর 'অমৃতকুণ্ড' নামক একখানি কেতাবের চল আছে সাধু পরম্পরায়, ওই কেতাব সংস্কৃতে লেখা। ওর ভেতরকার যোগতত্ত্বগুলোও সুফি সাধকগণ আরবি, ফারসিতে অনুবাদ করে নিয়ে বাংলার যোগযৌগিক কায়াবাদকে পারস্য ধারার সঙ্গে মেলাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, বহমান চলতি স্রোতের ভেতর নিজেদের মতাদর্শকে ভরে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত ভাব এনে জনগণকে নিজেদের ধর্মের ভেতর সুচারু মিলঝুলপন্থায় টেনে আনা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে সেজন্যই বাংলার দেহাত্মবাদে পারস্যের সুফিতত্ত্বের ভেতর তাই যোগ হয়েছে বাংলার কায়াবাদীদের বহমান যোগসাধনা আর তান্ত্রিক মতামতে শরীর খোলার পদ্ধতি। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী সাধন, সহজিয়া সাধন পারসিক সুফিদের তরিকার ভেতর ধ্যান-ধারণা ও সাধন প্রণালীর আদর্শে মিলেমিশে গেছে কেবলমাত্র বাংলার দেহাত্মবাদের আবহাওয়াকে কব্জা করার জন্যই। আরব, পারস্য, বাংলা...এই ত্রিবেণীর স্রোত বাংলার দেহাত্মবাদে যে বইছে এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষে মানুষে সাম্য আর মানুষের উৎকর্ষতাতে কায়াবাদীরা আদতে জোর দিয়েছিলেন। সোনার মানুষ, ভাবের মানুষ, রসের মানুষ, মনের মানুষ...সমস্ত নিগূঢ় কায়াবাদী দেহপ্রণালীর ভাঁজে মরমিয়ারা মানুষের উৎকর্ষতাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এগারো শতকে রুমিই সর্বপ্রথম সুফিবাদ নিয়ে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। জালালউদ্দিন রুমির 'মসনবি' কিতাব দিয়েই বাংলার সাহিত্য ধারায় সুফিতত্ত্বের পরিচায়ন ঘটে।

এমনকী ভারতের ইসলামও পাকাপোক্ত হয় সুফি-দরবেশদের মাধ্যমেই। অসাম্প্রদায়িক প্রেমময় ইসলাম সুফিসাধকদের আশেক আর মাশেক... অর্থাৎ, স্রষ্টার সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্কের যোগই ভারতের মাটিতে থাকা দেহাত্মবাদকে কব্জা করতে অনেক বেশি সুবিধাজনক হয়ে যায়। সুফি অর্থ পাক-পবিত্র। আত্মার পবিত্রতা নিয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ চিরকালই কথা বলে এসেছে। সেজন্যই পারসিক সুফিদের ঐশী সত্তার উপলব্ধির চেতনাটি এখানে একাত্মবোধে বসে যেতে খুব সুবিধা হয়েছে। সুফিবাদ পুরোপুরি গুরুমুখী হওয়ার কারণেই ভারতের গুরুবাদে তা অতি অনায়াসে বসে যেতে পেরেছে। বাংলার দেহাত্মবাদীর ধর্মও মুর্শিদ-গুরু নির্ভর। সেজন্যই বাংলার আবহাওয়ায় সুফিবাদের মানুষতত্ত্বের মূলনীতিটি জনগণের কাছে আপন বলে মনে হয়েছে।

দেহাত্মবাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয়ের দুয়ার ধরে মন চঞ্চল ও মহাগ্রস্ত হয়। মোহকে ধ্যানের ভেতর এনে দুর্বল করার প্রক্রিয়াটি আবার সুফিবাদের। সুফিরা নৈকট্যে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন, আল্লাহকে পেতে হলে তাঁর কাছাকাছি যেতে হবে। দেহাত্মবাদীরা সকলেই নৈকট্যের কথাখানাই বলেছেন। সহজিয়ারা বলেন, প্রাকৃত দেহ হলো গিয়ে রূপ। রূপকে আগে আশ্রয় করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রূপ। যখন দেহের ভেতরই শৃঙ্গাররসঘন তিনি জেগে যাবেন তখনই দেহের অপ্রাকৃত স্বরূপ। অপ্রাকৃত স্বরূপে গেলেই বোঝা যাবে দেহভাণ্ডের ভেতরই রসের মানুষ উদয় হচ্ছেন। এই মানুষই শ্রীকৃষ্ণ। ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড দেখতে হবে। তবেই দেহে পরমতত্ত্ব বাসা বাঁধবে। পরমতত্ত্বের কোনও রূপ নেই, রেখা নেই, আকার নেই, বিকারও নেই। জ্ঞান ও ধ্যানের পারে যেতে পারলেই তত্ত্বটি স্ফুট হবে। এর আগে নয়। আউল সম্প্রদায়ী যাঁরা, সকলেই তাঁরা মানুষের মধ্যেকার ভেতর মানুষের সেবাতে তৎপর। আউল শব্দটিও আরবি। এর অর্থ একান্তে সেবা। বাউল শব্দের মধ্যেও ব্যাকুলতার একটা ছোঁয়া আছেই। একাত্ম বিভোর দশার কথা দেহাত্মবাদী সাধুরা বারবার বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, তত্ত্ব আছে মানুষকে ঘিরে। জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, মাটিতত্ত্ব...পঞ্চতত্ত্বের সমস্তটাই দেহ ঘিরে। সেজন্যই দেহ বাদ দিয়ে ধর্মাচরণ হয় না। চৈতন্যকে আশ্রয় করে আছে দেহ। ওই হলো প্রাণতত্ত্ব। চৈতন্য যখন পরম চৈতন্য দশাতে গেল তখন ভাণ্ড বিভাণ্ড হলো। দেহ দেহাতীত হলো। বিভাণ্ড হলেই ব্রহ্মাণ্ড তখন মানুষের মধ্যেই এলো। এই মানুষই মনের মানুষ।

দেহের মধ্যেই থাকে কামকেন্দ্র। কামকেন্দ্র থেকেই শক্তিপাত হয় দেহের। দেহে যেমন কামের দরজা আছে, যাকে দেহাত্মবাদীরা বলেন নিম্নদ্বার,

তেমনই দেহের ওপরের দরজা আছে, যাকে বলে সূক্ষ্মদ্বার। সহজিয়ারা বলেন, ব্রহ্মদ্বার। ব্রহ্মদ্বারের ভেতর দিয়ে গেলে যুগলভজনার যে রমণদশা তা হলো গিয়ে অনন্ত রমণ। মূলাধারে দেহের আগল খুলেই শক্তিপাত। আর সহস্রারে ব্রহ্মদ্বারে যখন শক্তি ওঠে তখন অন্তত রমণে গিয়ে নিচের দরজাটা একেবারেই বন্ধ করে দেন সাধক। ওপরের দরজা যখন খুলল তখনই মনের মানুষের সঙ্গে মিলন হলো। অনন্ত রমণ না করতে পারলে মনের মানুষের নৈকট্যে যাওয়া যাবে না। সুফিরাও একইরকম নৈকট্যের কথা বলেছেন। এখানে যুগল হলো আশেক আর মাশেক। দেহ যখন পবিত্র হলো পির মুর্শেদের আনুগত্য পেয়ে তখনই নৈকট্য এলো আল্লাহর। কালেমা, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ...এগুলো শরিয়তি নৈকট্য। সায়রা শব্দ থেকে শরিয়ত শব্দটি উদ্ভূত। সায়রা কথার অর্থ হলো প্রধান রাস্তা বা সড়ক। যখন গুরুর নৈকট্য এলো তখনই রাস্তা বদলে গেল। রাস্তায় তখন অনেক বাতনি নিয়ম কানুন। এই হলো তরিকতের দরজা। তারিক শব্দ থেকে তরিকত। তরিকতের মানে রাস্তাতে চলা নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত হওয়া। গুরুর সঙ্গে নৈকট্য এলেই গুরুর কাছে গেলেই নিয়ম কানুন জানা যাবে। এই যে পির গুরু, দরবেশ মুর্শেদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেওয়া এও তো একপ্রকার ফানা। গুরুর সঙ্গে নৈকট্য এলেই মাশেকের সঙ্গেও নৈকট্য আসবে। মাশেক হলো স্রষ্টা। যখনই পির-ফকির-দরবেশদের সঙ্গে নৈকট্য এসে গেল তখনই খুলে গেল মারফতের দরজা। উরফুন শব্দ থেকে এসেছে সুফি মারফত। গুরুর নৈকট্যে থেকে যে আহরিত জ্ঞান উঠল দেহের ভেতরে, তাই হলো গিয়ে মারফত। দেহের সত্তাটিকে জানা হলো মারফত। যখন জানা গেল দেহের নিম্নদ্বার দিয়ে গিয়ে ঢুকে ব্রহ্মদ্বারের পর স্থিতধী অবস্থানে এসে বিভাণ্ডটা তখনই হাকিকত এলো। হাক্কুন শব্দ থেকে হাকিকত এসেছে। যার অর্থ হলো ধ্রব সত্য। হাকিকত হলো সুফিদের সাধনার শেষ স্তর। এখানেই আল্লাহর সঙ্গে চরম নৈকট্য। এখানেই ফানা ফিল্লাহ,

ফানাফির সেখ বাদে আছে, ফানকির রছুল
ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা, একই গাছের মূল

আশেক আর মাশেকের যখন মিলন হলো তখনই সৃষ্টি হলো আসলে মরমিয়াবাদ। মরমিয়াবাদীরা যখন আশেক হয়ে মাশেকের জন্য আকুলপারা হন তখনই আসে সুরের কালাম। আধ্যাত্মিক বাণী বলে চলেন ওঁরা

ইবাদতস্বরূপ মরমি গানের ভেতর। এই গানের ভেতর দিয়ে নবিশ শিষ্যর আবার জ্ঞান আসে। সেজন্যই এখানকার পরিমণ্ডলে গান হলো গিয়ে জ্ঞান। গানের ভেতর দিয়েই মরমিয়াবাদীরা সাধনের পবিত্রতা রক্ষা করার তরিকা বলেন, ধৈর্যের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর নূর হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হবে সেকথাও ব্যক্ত করেন, খোদাপ্রেম নিয়ে গান বাঁধেন তাঁরা, নিজের অনুশোচনা, মুর্শেদে নির্ভরশীলতা ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের বাণী দিয়েও রচিত হয় কত কত সুফি সঙ্গীত, মারফতি গান, মুর্শিদ্যা গান। গানের ভেতর দিয়েই আবার জিকির করেন ওঁরা। দেহাত্মবাদীদের সঙ্গীত হলো দেহের অনুভূতিকে পরমের অনুভূতিতে মিশিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া। গানের ভেতর দিয়েই প্রেম-বিচ্ছেদ, চাওয়া-পাওয়ার আর্তি ব্যক্ত করা প্রেমময়ের কাছে। সুফিরা বলেন, গান মোকাম। গান থেকেই আসে জ্ঞান। সেজন্যই সুফিসঙ্গীতের ভেতর তওবা থাকে। ধ্যানে মগ্ন হওয়ার যে প্রক্রিয়াগুলো সুফিগানের ভেতর দিয়ে বলা হয় তাই হলো গিয়ে তওবা। গানের ভেতর জিহাদ থাকে। দেহের ভেতরই তো শত্রু। রিপুর শত্রু জয় করার নানান তরিকা বলা হয় সুফিগানে। যখন মরমিয়া সাধক ওয়ারা...নিজের বৃত্তি বা পেশা থেকে সরে যান কালাম লেখাই প্রধান কাজ তখন। সুফিগানের রচয়িতারা সকলেই এজন্যই সাধক। তাঁরা ভোগসুখ থেকে সরে গিয়ে জোহদ হন, বিরত হন ভোগের বস্তু থেকে। খিদে, তৃষ্ণা থেকেও যতটা সম্ভব বিরত থাকেন তাঁরা। সুফি মোকামে তাই বলা হয় জো ওরক আল শাহওয়া...খিদের সময় ধৈর্য ধরো। কম খাও। বেশি খেলে জিকর-ধ্যান এসব হবে না ভারী শরীর নিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখো গুরুর প্রতি...একিন করো। সিদক হও...চিন্তায় সত্যবাদ আনো আর সেই সত্যকে ছড়িয়ে দাও, জিকর করে...স্রষ্টার উদ্দেশ্যে জপ করে। সেজন্যই সফর করো। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাও। মতবাদ প্রচার করো। দারিদ্র বরণ করো...ফকর করো, সাদামাটা জীবন যাপন করে তসাওফ...দেহমনের পবিত্রতা রক্ষা করো। আদব করো...ভদ্র ব্যবহার হোক তোমার সকলের সঙ্গে। শওক হও তুমি...সব সময় স্রষ্টার জন্য ব্যাকুল থাকো। তবেই মারফত পাবে। মহাজ্ঞান আসবে। বুঝতে পারবে সকল ইরাদা তোমার তাঁর জন্যই, তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হচ্ছে। সুফিবাদীরা এসব মোকামের ভেতর দিয়েই সাধন পথে এগোন।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ হলো গিয়ে রাগ। অন্তর্নিহিত ভাব ও রূপকে প্রকাশ করে রাগ। রাগ প্রকাশের জন্য শরীর লাগে। কেননা শরীরের ভেতরই সুরতরঙ্গগুলো ভাবধারাকে বইয়ে দেয়। রাগের সেজন্যই নানান ধ্যানমুদ্রাও

কল্পনা করা হয়েছে। ধ্যানের ভেতর দিয়ে এসে রাগের ছবি দেখতে গিয়েই সঙ্গীতের আচার্য-গুরুরা রাগের ভেতর দেবদেবীর মূর্তির কল্পনা এনেছেন। রাগ রসকে প্রকাশ করে। কোন রাগ কোন রসকে প্রকাশ করে সেটাই সঙ্গীত সাধকের জ্ঞাতব্য বস্তু। এটা জানতেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে গুরুমুখী করে ঘর-ঘরানার ভেতর ফেলা হয়েছে। 'রাগ ও রূপ' এবং 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ওঁর লেখা বইগুলো সঙ্গীতের রাগ ভাবনা ও ধ্যান কল্পনার জন্য সবিশেষ উল্লেখ্য। শরীরে যেমন ধ্যান প্রক্রিয়া ও কুণ্ডলিনী সাধনায় নাদধ্বনি ওঠে তেমনই সঙ্গীত সাধনার ভেতর দিয়েও নাদ আসে, গীতং নাদাত্মকম্। দেহাত্মবাদী সাধকদের লেখা গানগুলির ভেতর রাগ-রাগিণীর সুরতরঙ্গ সেভাবে থাকে না। যা থাকে তা হলো গিয়ে ভাবের প্রকাশ। এজন্যই দেহতত্ত্বের গানগুলোকে অনেকেই ভাবগান বলে থাকেন। গুরুই চেনান মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ধরা এই শরীরখানা। আর সেই শরীরটার জন্ম হয়েছে মা-বাবার শরীরের উপাদান মিশিয়ে। কায়াবাদী গুরু বলেন, মায়ের মাংস, ত্বক, রক্ত, কেশ আর বাবার হাড়, শিরা, শুক্র, মগজ নিয়েই আমরা এসেছি এই ভবে। আমাদের আসার যৌনাত্মক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বহুরকমের তত্ত্ব আছে, বিশ্বাস আছে গুহ্য সাধনায়। সেই গুহ্য উপাদানের প্রথমটিই হলো গিয়ে সাধনসঙ্গিনীর রজো। এই রজো হলো গিয়ে সাধকের শুক্রবীজের ধারক ও সম্মোহক। কায়াবাদী গুরু বলেন, সাধিকা নারীর রজো হলো গোপন চিজ। সেই চিজ দিয়েই মানুষের করণ করতে হবে। সেইসব করণ নির্দেশিকাই ধরা আছে দেহাত্মবাদীদের কায়াবাদী সাধনসঙ্গীতে। আখড়া-মেলায় দোতারা-একতারার আওয়াজ গুনগুনায় আর নানান সব দুর্বোধ্য কথার ভেতর দিয়ে গান ওঠে। এই গান বুঝতে হলে গুরু দরকার। তিনিই আত্মার নিরঞ্জন মূর্তি ভেঙে দিয়ে বস্তু চেনান শিষ্যদের। তারপরই বস্তুর ভেতর দিয়ে নতুন আত্মার বিকাশ ঘটতে থাকে শিষ্য-বায়েতদের ভেতর। এভাবেই দোতারা, খমক, করতাল, বাঁশি, একতারা, খোল, খঞ্জনির আওয়াজে বেবলগা কথাগুলোকে ধরতে সচেষ্ট হন নতুন মুরিদ। শরিয়ত-মারিফতের ব্যাখ্যা চলে তত্ত্বজ্ঞানী মুর্শেদের কথায়। পাল্লাদারি গানও হয় কায়াবাদীদের আসরে। দুই মুর্শেদই তত্ত্বজ্ঞানী, জব্বর গায়ক। এক এক করে গাইতে থাকেন আসরে উঠে দাঁড়িয়ে। তাঁদের ডান হাতে একতারা, বাঁ হাতে কোমরে বাঁধা ডুবকি বাজছে, পায়ে ঘুঙুর। এক মুর্শেদের গানে প্রশ্ন করা হচ্ছে। অন্যজন তার জবাব দিয়ে ঘুরিয়ে আবারও প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন।